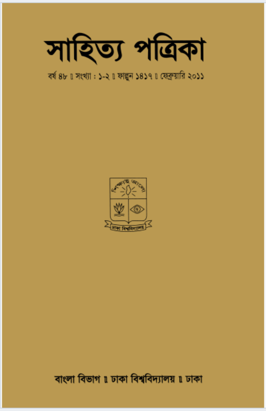

Vol. 48 | No. 1-2 | 2011

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

ফুলমণি ও করুণার বিবরণ এবং ইউরোপীয় নারীর চোখে উনিশ শতকের পল্লিবাংলা

Volume	48
Issue	1-2
Year	2011
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	জোবায়ের মোহাম্মদ ফারুক
Published online	February 1, 2011
DOI	10.62328/sp.v48i1-2.11
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v48i1-2.11
Pages	189-208
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

ফুলমণি ও করুণার বিবরণ এবং ইউরোপীয় নারীর চোখে উনিশ শতকের পল্লি

Check for updates

জোবায়ের মোহাম্মদ ফারুক*

ফুলমণি ও করুণার বিবরণ গ্রন্থের লেখক হান্না ক্যাথেরিন ম্যলেন্স (১৮২৬—১৮৬১) (Hannah Catherine Mullenes) একজন ইউরোপীয় মহিলা। তিনি খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী ছিলেন। ম্যলেন্সের পিতা পাদরি ফ্রাঁসোয়া লাক্রোয়া ও স্বামী ডা. জে ম্যলেন্স উভয়েই ছিলেন ধর্মযাজক। তিনি নিজেও ছিলেন ধর্মপ্রচারক, লন্ডন মিশনারি সোসাইটির কর্মী। ম্যলেন্সের জন্ম কলকাতায়। তিনি ছোটবেলায় পিতার কাছে বাংলা শেখেন এবং পরবর্তীকালে এ ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন।

হান্না ক্যাথেরিন মূলত এ দেশের মেয়েদের জন্য শিক্ষাকাজে বিশেষভাবে ব্রতী ছিলেন। "মাত্র বারো বছর বয়সেই তিনি স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন।"[১] জানা যায়, তাঁর উদ্যোগে ইংল্যান্ড থেকে চাঁদা সংগৃহীত হত এ দেশের মেয়েদের জন্য ভবানীপুর ও আশপাশের গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপনকল্পে। এ স্কুলে বাংলার পাঠদান করতেন ম্যলেন্স। এতে করে বাংলা ভাষাতে তাঁর দক্ষতার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। খুব সম্ভবত জীবিতকালে ম্যলেন্স ১৮৪১ এবং ১৮৫৮ সালে মোট দুবার ইংল্যান্ড গমন করেন। তিনি তাঁর পরিবারের কাজের লোক ও তাদের সন্তানদের জন্য পিতৃগৃহে শিক্ষাদানের একটি প্রচেষ্টা হাতে নিয়েছিলেন। শিক্ষক হিসেবে তিনি ছিলেন বেশ জনপ্রিয়।

১৮৪৫ সালের ১৯ জুন ম্যলেন্স বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। বিয়ের পরও তাঁর শিক্ষাব্রত অটুট থাকে। ম্যলেন্সের স্বামীও ছিলেন একজন শিক্ষানুরাগী ও ধার্মিক মানুষ। বিয়ের পর ম্যলেন্স মেয়েদের জন্য একটি স্কুল ও বোর্ডিং পরিচালনা করতেন। সেখানে তিনি দেশীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টির প্রতি বিশেষ জোর দিতেন। এ সময়েই ১৮৫২ সালে ম্যলেন্স *ফুলমণি ও করুণার বিবরণ (Phulmani and Karuna; a book for native Christian Women)*[২] রচনা করেন। "এই বইটি বিভিন্ন মিশনারি বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে পড়ানো হত।"[৩] কলকাতায় ১৮৫৫ সালে জেনানা মিশন স্থাপিত হয় ক্যাথেরিনের উদ্যোগে। এ মিশনের অধীন চারজন কর্মী বিভিন্ন এলাকা ঘুরে ঘুরে উচ্চবর্ণের হিন্দু পরিবারে মেয়েদের শিক্ষাদান করতেন।

১৮৬১ সালে পিতার মৃত্যুর পর কলকাতায় *পাদরি সাহেবের বজরা* নামক নতুন একটি রচনায় তিনি মনোনিবেশ করেন। কিন্তু অকালমৃত্যুর কারণে এই রচনাটি তিনি সম্পন্ন করে যেতে পারেননি।

ফুলমণি ও করুণার বিবরণ Calcutta Christian Tract and Book Society থেকে প্রকাশিত হয়। এটি মূলত *The week* নামক একটি ইংরেজি গ্রন্থের অনুকরণে

* পি-এইচ.ডি. (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), উন্নয়নকর্মী।

লেখা। বিশিষ্ট সমালোচক অচ্যুত গোস্বামী (১৯১৭–১৯৮০) *ফুলমণি ও করুণার বিবরণ* সম্পর্কে বলেছেন—

> বইখানিতে খ্রিষ্টীয় আদর্শ প্রচারের অভিসন্ধি থাকলেও লেখিকা মহিলা বলে কার্যত পারিবারিক জীবনে গৃহিণীর দায়িত্বের প্রসঙ্গকেই কাহিনীর উপজীব্য করে তুলেছেন। বিদেশিনী মহিলা যে এদেশের গ্রাম জীবন সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন তার পরিচয় আছে কাহিনীটির মধ্যে।[৪]

এটি বাংলা মৌলিক গদ্যকাহিনীর মর্যাদা লাভের ক্ষমতা রাখে। যদিও এই গদ্যকাহিনীটি লিখিত হয়েছিল খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এবং সে কারণে এটি তৎকালীন হিন্দু বুদ্ধিজীবীসমাজে সাদরে গৃহীত হয়নি।

হান্না ক্যাথেরিন ম্যলেন্স দশটি অধ্যায়ে রচিত *ফুলমণি ও করুণার বিবরণে* তাঁর সমকালের বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের কিছু বস্তুনিষ্ঠ ছবি ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। যদিও লেখিকার মূল অভীষ্ট ছিল খ্রিষ্টধর্মের উৎকর্ষ প্রচার। বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর আলাপচারিতা কিংবা ঘটনার মাঝখানে খ্রিষ্টবাণীর প্রকাশ এই রচনাটিকে কিছুটা হলেও ধর্মমূলক গ্রন্থের কাছাকাছি নিয়ে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও *ফুলমণি ও করুণার বিবরণে* উপন্যাসোচিত উত্তাপ পরিলক্ষিত হয়। লেখিকা এ দেশে জন্মগ্রহণ করায় ও এ দেশের সমাজের সাথে ওতপ্রোতভাবে ঘনিষ্ঠ থাকায় এখানকার মানুষদের প্রতি প্রবল সহানুভূতি পোষণ করতেন। তাঁর "গ্রন্থ রচনায় এই মনোভাব ক্রিয়াশীল ছিল; তাই ভাষায় অনাবশ্যকভাবে বৈদেশিকতা আনায় তাঁর উৎসাহ ছিল না।"[৫]

ফুলমণি ও করুণার বিবরণে লেখিকা কল্পনার আশ্রয় নিয়েছিলেন। কাহিনীর শুরুতেই তিনি আত্মপরিচয় গোপন করে নিজেকে মিশনারি হিসেবে প্রকাশ না করে জনৈক ম্যাজিস্ট্রেটের স্ত্রী হিসেবে পরিচয় দান করেন। লেখিকা নিজ জবানিতেই কাহিনী বর্ণনা করেছেন। 'ফুলমণি' ও 'করুণা' নামক দুটি নারী-চরিত্রের দ্বারাই নামকরণ করা হয়েছে এই কাহিনীর। এতে দু-একটি চরিত্র ছাড়া বাকি সবগুলো চরিত্রই খ্রিষ্টান এবং এর পটভূমিকাও খ্রিষ্টানপল্লি। ঘটনাপ্রবাহের চেয়ে বাইবেলের ব্যাখ্যাই বেশি সন্নিবেশিত হয়েছে *ফুলমণি ও করুণার বিবরণে*।

বঙ্কিম-পূর্ব বাংলা গদ্যকাহিনীগুলোর মধ্যে একমাত্র *ফুলমণি ও করুণার বিবরণ*-ই একজন নারী কর্তৃক রচিত। সে কারণেই সম্ভবত এই কাহিনীর চরিত্র চিত্রণে নারী-প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। লেখিকার সচেতন প্রয়াসেই নারী-চরিত্রগুলো প্রধান হয়ে উঠেছে কাহিনীতে। এখানে পুরুষ-চরিত্রগুলো অনেকটাই নিস্তেজ এবং প্রতিনিধিত্বহীন। এই নারী-প্রাধান্যই কাহিনীকে একটি ভিন্ন মাত্রা দান করেছে বলা যায়।

২.

ফুলমণি ও করুণার বিবরণ-এ মূলত খ্রিষ্টানপল্লির সমাজকাঠামো চিত্রিত হয়েছে।[৬] উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক আমলের খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের জীবনগাথার অনেক ছবি পাওয়া যায় এই গদ্যকাহিনীতে। শুধু খ্রিষ্টান সম্প্রদায়কে নিয়ে রচিত হলেও এই কাহিনীতে যে

তৎকালীন সমাজের সার্বিক প্রেক্ষাপটও অনেকাংশে উপস্থিত থেকেছে তা বলা যেতে পারে। আমরা জানি, লেখিকা হান্না ক্যাথেরিন ম্যলেন্স একজন ইউরোপীয় মহিলা। তাঁর বাংলা ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তির ফসলই এই গদ্যকাহিনী। বাংলা ভাষায় দক্ষতা থাকলেও মনোগত একটা পার্থক্য নিশ্চয় ছিল তাঁর মধ্যে— এ ভাষার অন্য দেশীয় লেখকদের সঙ্গে, এ কথা আমাদের স্বীকার করতে হবে। এ ছাড়াও আরেকটি কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, এর রচয়িতা একজন নারী। তাই এ কাহিনীতে ভিনদেশি এক লেখিকার নারীসুলভ দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন থাকবে— এটাই স্বাভাবিক। উনিশ শতকে বঙ্কিম-পূর্ব গদ্যধারায় অন্য লেখকদের তুলনায় *ফুলমণি ও করুণার বিবরণে* কাহিনীর প্রকাশভঙ্গি অনেকখানি শোভন এবং রুচিগত উৎকর্ষে পূর্ণ। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে— "লেখিকা বাঙালী সমাজের আচরণ, সংসারযাত্রার সাধারণ ছন্দ ও সংলাপরীতির সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় অর্জন করিয়াছিলেন ও বাংলা ভাষার উপর তাঁহার অধিকার সীমাবদ্ধ হইলেও প্রশংসনীয়।"[৭]

ফুলমণি ও করুণার বিবরণে ম্যলেন্স তৎকালীন গ্রামীণ খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের গৃহজীবনের দিকেই দৃষ্টিপাত করেছিলেন। এ শ্রেণির গার্হস্থ্য-জীবনের যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয় অত্যন্ত নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে কাহিনীতে। আর এসবই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ধর্মের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের তাগিদে। কাহিনীতে সেকালের গ্রামের খ্রিষ্টানপল্লি, তাদের বসবাসের ধরন কিংবা গৃহসজ্জা প্রভৃতির বেশ বিস্তারিত চিত্র দেখা যায়। খ্রিষ্টান-গ্রামের বর্ণনায় পরিলক্ষিত হয়, জজসাহেবের স্ত্রী গ্রামে প্রবেশ করে 'চারি পাঁচখানা কুঁড়ে ঘর' দেখতে পেলেন। ওসব ঘরের অপরিষ্কার উঠোনের সামনে 'উলঙ্গ বালকেরা কাদা ও ধূলা দিয়া' খেলার ছলে পুতুল গড়ছিল।[৮] বেশ বাস্তব ও চিরচেনা দারিদ্র্যক্লিষ্ট গ্রামবাংলার ছবি যেন এটি। কুঁড়েঘর, অপরিষ্কার উঠান এবং উলঙ্গ শিশুদের মাধ্যমে তখনকার গ্রামবাংলার অভাবগ্রস্ততা ও নিম্ন জীবনমানের পরিচয় ফুটে উঠেছে। বর্ণনাটি খ্রিষ্টানপাড়ার হলেও এটি তখনকার গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের বাস্তব প্রতিচিত্র। গ্রামের মানুষ তথা কৃষকশ্রেণির দুরবস্থার কথা বলতে গিয়ে ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৫৭ তারিখে প্রকাশিত 'সম্বাদ প্রভাকর' পত্রিকা লিখেছিল— "বঙ্গদেশীয় কৃষক সামান্য ছিন্ন বস্ত্র পরিধান ও মোটা অন্ন আহার করে, তাহার কঠোরোপার্জ্জিত অল্প আয়ের গ্রাহক বিস্তর,...।"[৯] এখানে গ্রাম্য কৃষকের দুরবস্থার চিত্রে গ্রামবাংলার সেই সময়কার সর্বব্যাপী দরিদ্রতার রূপটি দেখা যাচ্ছে, যেটি কাহিনীর প্রকাশভঙ্গির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ।

গ্রামের খ্রিষ্টানপাড়ায় অবস্থিত ফুলমণির বাড়ির বিবরণ দিতে গিয়ে লেখিকা যেভাবে বস্তুনিষ্ঠ চিত্র আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন তা অনবদ্য। বাড়ির চারপাশে দরমা এবং বাঁশ দিয়ে তৈরীকৃত বেড়া, সেখানে ঝিঙেলতার উপস্থিতি, উঠানের এক পাশে গোয়াল ঘর, সেখানে গরু ও বাছুর কিংবা ঘরের চালায় লাউয়ের লতা প্রভৃতির বর্ণনায় যেন চিরচেনা গ্রামবাংলার স্বাভাবিক চিত্রই দেখা যাচ্ছে। সে সময়কার বাঙালি গ্রামজীবনের এ চেনা রূপটি এ দেশে অনেককাল পর্যন্ত বিরাজমান ছিল, বলা যায়। আমরা বিশ শতকের অনেক সাহিত্য রচনাতেও গ্রামবাংলার এই চেহারাটি খুঁজে পাই। বাড়ির চিত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে কাহিনীতে আরো বর্ণিত হয়েছে—

> দাবার সম্মুখে ঘরের ছাঁচির নীচে দশ বারটি চারা গাছ গাম্‌লাতে সাজান দেখিলাম; তাহার মধ্যে তিন চারিটি ঔষধের গাছ ছিল, অন্য সকল গ্যাঁদা তুলসী গন্ধরাজ ইত্যাদি। একটি অতি সুন্দর চীন গোলাপের চারাও ছিল, তাহাতে কুঁড়ি ও ফুল ধরিয়াছিল।[১০]

সেকালের গ্রামের গৃহস্থবাড়ির বাগান-ব্যবস্থাপনার একটি চিত্র পাওয়া যাচ্ছে ওপরের বর্ণনায়। খ্রিষ্টানবাড়িকে উপলক্ষ করে এই বাগানচর্চার বিষয়টি হয়তবা লেখিকার নিজস্ব মানসজাত রুচির প্রকাশক হতে পারে। কারণ ইউরোপীয়দের কাছে 'ফুলের মূল্য' যে অনেকখানি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। লেখিকা ইউরোপীয় ছিলেন বিধায় বাগানচর্চার বিষয়টি কাহিনীতে বেশ গুরুত্ব পেয়েছিল, এ কথা জোর দিয়ে বলা যেতে পারে।

পল্লির বাঙালি গৃহের আরেকটি বর্ণনা কাহিনীতে পাওয়া যায়, করুণার গৃহচিত্র প্রকাশের দ্বারা। করুণার গৃহের দৈন্যদশার চিত্র লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে লেখিকার উদ্দেশ্য যা-ই হোক না কেন, এটি যে সে সময়কার অভাবক্লিষ্ট বাঙালি গ্রামীণ পরিবারের একটি বস্তুনিষ্ঠ প্রতিফলন হয়ে উঠেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। করুণার বাড়ির বর্ণনা দেয়া হয়েছে এভাবে—

> করুণার উঠানের মধ্যে একটি ছোট রান্না ঘর ছিল বটে, কিন্তু তাহার চাল সমস্ত ভাঙ্গিয়া পড়াতে উনুন ও রন্ধন করিবার দ্রব্য সকল বড় গৃহের দাবায় রাখিয়াছিল।...তাহাতে ধূঁয়া প্রযুক্ত আমি গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিয়া, দেখিলাম সে গৃহও ভগ্নপ্রায় হইয়াছে।[১১]

ভাঙা রান্নাঘর আর ভাঙা বসতগৃহের চিত্রটি তখনকার দিনের হিন্দু, খ্রিষ্টান বা মুসলমান সব দরিদ্র বাঙালি পরিবারের ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। কারণ, ব্রিটিশ শাসনামলে বিভিন্ন দেশীয় ও বহির্দেশীয় নিপীড়নে সেকালে এ দেশের সাধারণ মানুষের অবস্থা যে বেশ করুণ হয়ে উঠেছিল তা বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায়। অভাব, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি নানা রাহু বাংলার কৃষক এবং সাধারণ মানুষকে যে গ্রাস করেছিল, তা ঐতিহাসিকভাবে জানতে পারি আমরা। লুণ্ঠনের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের যে অন্যায় প্রক্রিয়া চলছিল তখন সেটির মধ্যে এ দেশের সাধারণ মানুষ বেঁচে থাকার ন্যূনতম চাহিদা মেটাতেও অপারগ ছিল।

সেকালে এ দেশের ইংরেজ সম্প্রদায়ের স্বভাবজাত উদ্যানচর্চার চিত্রটিও ফুটে উঠেছে *ফুলমণি ও করুণার বিবরণে*। জনৈক ইংরেজ সাহেবের বাগান-পরিচর্যাবিষয়ক বর্ণনা থেকে এই বিষয়টি দৃশ্যমান হয়। ইংরেজ সাহেব কর্তৃক স্বীয় মালীকে বাগানে বিলাতি ফুল চাষ করতে উৎসাহ প্রদানের দৃশ্য থেকে বোধগম্য হয়, ইংরেজরা এ দেশেও বিলাতের বিভিন্ন ফুলের বপনচর্চায় সচেষ্ট ছিল। কাহিনীতে বর্ণিত হয়েছে—

> ছবিযুক্ত একখান ইংরাজী পুষ্প বৃত্তান্ত পুস্তক বৃদ্ধ মালিকে দিয়া কহিয়াছিলেন, শুন মালি, যে সকল বিলাতীয় ফুল এদেশে জন্মিতে পারে তাহা আমি আপন বাগানে আনিয়া রাখিতে ইচ্ছা করি। অতএব তুমি এই সকল ফুলের ছবি ভাল করিয়া দেখ: পরে ইহার মধ্যে যত ফুল এ দেশীয় ফুলের সমান হয়, তাহা আমাকে বলিও।[১২]

কাহিনীতে এ জাতীয় বিলাতি ফুল চাষের প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইংরেজদের পুষ্পপ্রীতির পাশাপাশি তাদের স্বদেশের প্রতি একটা সহজাত মমত্ববোধেরও পরিচয় ফুটে উঠেছে।

নিজেদের দেশের কৃষ্টিসহ বিবিধ বিষয়কে যে ইংরেজরা ভারতবর্ষের মাটিতে আনতে উৎসুক ছিল, এমন চিত্র অবলম্বন করে, তা বলা যায়।

আমরা জানি, *ফুলমণি ও করুণার বিবরণ* কাহিনীটি খ্রিষ্টধর্ম প্রচারার্থে লিখিত; ফলে স্বাভাবিকভাবেই এতে ধর্মমূলক আলোচনাই বেশি স্থান পেয়েছে।

এই কাহিনীতে লেখিকা খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের প্রার্থনা, এদেশীয়দের খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়া, খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রভৃতি বিষয়েরও বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। তিনি একজন ধর্মনিষ্ঠ খ্রিষ্টান পরিবারের পরিচয়দানের মধ্য দিয়ে রবিবারে গির্জায় যাওয়া এবং পারিবারিক ধর্মনিষ্ঠার বিষয়ে নিজস্ব অভিমত প্রকাশেরই চেষ্টা করেছেন কাহিনীতে। যেমন—

> পাঁচ ঘণ্টার সময়ে পিতা ও ভ্রাতা পুনর্ব্বার গীর্জায় যান,...গীর্জা হইতে সাত ঘণ্টার সময়ে আইসেন, পরে ভোজনাদি সাঙ্গ হইলে আমরা আরবার গান গাই, কিম্বা দাদা যাত্রিকের যাত্রাপুস্তক পড়েন, আমরা সকলে বসিয়া শুনি। শেষে প্রার্থনা করিয়া শয়ন করিতে যাই।[১৩]

একটি ধার্মিক খ্রিষ্টান পরিবারের চিত্র ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে যে লেখিকা নিজস্ব ধর্মীয় বোধের আশ্রয় নিয়েছিলেন, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। বিশেষত, কাহিনীতে এ ধরনের নিজস্ব ভাবধারার প্রকাশ ঘটানোর ক্ষেত্রে ম্যলেন্স অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন, সেটি কাহিনী পাঠে বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এ দেশের মানুষদের 'সত্য' খ্রিষ্টান হিসেবে প্রতিস্থাপন ছিল লেখিকার মূল অভীষ্ট। তাই কাহিনীতে বেশ কয়েকটি ধর্মান্তরমূলক চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। এদেশীয় নিম্নবিত্তের মানুষ, যারা ইউরোপীয়দের বাড়িতে গৃহভৃত্যের কাজে নিয়োজিত থাকত, তাদের খ্রিষ্টধর্ম অবলম্বনের বিভিন্ন চিত্র পরিলক্ষিত হয় এতে। এ ধরনের চিত্রের মূল কথা হলো ইউরোপীয় খ্রিষ্টান মনিবদের সঙ্গে বসবাসের ফলে খ্রিষ্টধর্মের মাহাত্ম্য অনুভবের মাধ্যমে ভারতবর্ষীয় এসব গৃহভৃত্য-জাতীয় মানুষ খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করার জন্য উৎসাহী হয়ে উঠত। যদিও এ ধরনের বর্ণনা একেবারে সরলীকৃত বিশ্লেষণের দ্বারা অঙ্কিত হয়েছে, তবু এটির মূল পরিপ্রেক্ষিত যে আরো সুগভীর ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কাহিনীতে এ রকম একটি চিত্র সৃজিত হয়েছে— "আমি সেই দণ্ডে হিন্দু আয়া এবং বেহারার সাক্ষাতে উচ্চৈঃস্বরে বলিলাম, হে আমার ঈশ্বর! আমি তোমাকে বিশ্বাস করিয়া খ্রিষ্টিয়ান হইলাম,...।"[১৪] গৃহভৃত্যদের এরকম আরেকটি খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণের চিত্র প্রকাশিত হয়েছে কাহিনীতে। চিত্রটি এরকম—

> আয়া অনেক কাল ধার্ম্মিক আচরণ করিয়া সম্প্রতি বাপটাইজ হইতে অতিশয় ইচ্ছুক হইল। তাহাতে পাদরি সাহেব স্থির করিলেন, যে দিবসে রাণীর বিবাহ দেওয়া যাইবে, সেই দিবসে আয়া বাপটাইজিতা হইবে।[১৫]

নিম্নবিত্তের গৃহভৃত্য-জাতীয়দের খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণের পাশাপাশি কাহিনীতে উচ্চবংশীয় হিন্দু যুবকের খ্রিষ্টান হওয়ার তথ্যও আছে। কাহিনীতে উল্লিখিত যুবকটির ক্ষেত্রে বলা হয়েছে,

তিনি আগে ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু তিন বৎসর হলো খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছেন।[১৬] সে সময়কার প্রেক্ষাপটে এটি যে একটি বাস্তব চিত্র তা শিবনাথ শাস্ত্রীর *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ* গ্রন্থের সাহায্যে জানা যায়। তিনি এদেশীয়দের খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণের প্রসঙ্গে লিখেছিলেন—

> ডিরোজিওর শিষ্য ও রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের যৌবন-সুহৃদ মহেশচন্দ্র ঘোষ ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করার পর দেশমধ্যে যে আন্দোলন উঠিয়াছিল বলিতে গেলে তাহা আর থামে নাই।...এতদ্ব্যতীত গুরুদাস মৈত্র্য প্রভৃতি আরও কয়েকজন ভদ্রঘরের ছেলে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বন করেন। তন্মধ্যে ১৮৪৫ সালে একজনকে লইয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়।[১৭]

ভদ্র ঘরের ছেলেরা যে তখন অনেকে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তা জানা যাচ্ছে শিবনাথ শাস্ত্রীর রচনা থেকে। শিবনাথ শাস্ত্রী যে সময়ের কথা বলছেন সেটি *ফুলমণি ও করুণার বিবরণ* রচনার সময়ের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। উনিশ শতকে এদেশে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের প্রভাবে যে প্রবল সামাজিক আলোড়ন তৈরি হয়েছিল— এদেশীয় শিক্ষিত যুবকদের খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ মূলত সেটিরই প্রভাবজাত— এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতি এক ধরনের অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ সেকালের অনেক শিক্ষিত হিন্দু যুবককে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণে উৎসাহিত করেছিল। উনিশ শতকের কিংবদন্তি, মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ এজাতীয় আকর্ষণের ফলেই সংঘটিত হয়েছিল বলা যায়।

খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণের ফলে এদেশীয়দের তখন নানা রকম সামাজিক নিগ্রহের শিকার হতে হতো। কাহিনীতে বলা হয়েছে, "ও মা! খ্রীষ্টিয়ান হইও না, তোমার জাতি গেলে কেহ তোমার সঙ্গে বসিয়া খাইবে না।"[১৮] এদেশীয়দের খ্রিষ্টান হওয়ার বিষয়ে একটা জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল যে, ইংরেজরা নানাভাবে প্রলোভিত করে তাদের খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণে বাধ্য করে। অন্তত কাহিনীতে সেরকমই উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন— "জাতি ত্যাগ না করিয়া বরং কিছু দিন এ বিষয়ে বিবেচনা কর, পাছে লোকে বলে সাহেব লোকেরা ফাঁদ পাতিয়া তোমাকে খ্রীষ্টিয়ান করিয়াছেন।"[১৯] উনিশ শতকীয় সমাজে এদেশীয়দের খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়া বিষয়ে তখনকার পত্রপত্রিকাতেও নানা সংবাদ প্রকাশিত হতো। খ্রিষ্টান ধর্মযাজকদের প্রতি বিষোদ্‌গার করে প্রকাশিত এসব লেখার কিছু কিছু এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন, 'সংস্বাদ প্রভাকরে'র ২৮.১১.১২৫৯ তারিখে প্রকাশিত একটি লেখায় উল্লেখ আছে— "পাদ্রি ঠাকুরেরা ভারতবর্ষে আগমন পূর্ব্বক রাজধনে বিলক্ষণ হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া কেবল হিন্দু প্রজাদিগের সর্ব্বনাশ করিবেন, ইহা কি আমরা সহ্য করিতে পারি?"[২০] এরপর ৯.০১.১২৬০ তারিখে প্রকাশিত একই পত্রিকায় বলা হচ্ছে— "পাদ্রিরা যাহাকে দংশন করে সে ব্যক্তির আর রক্ষা নাই, সজীব থাকিয়া চিরদিন মৃতবৎ হয়।"[২১] ফাঁদ পেতে এদেশীয়দের খ্রিষ্টান বানানোর ক্ষেত্রে কাহিনীতে প্রকাশিত একই জাতীয় বিষয়ের অবতারণা 'সংস্বাদ প্রভাকরে'ও দেখা যায়। তবে 'সংস্বাদ প্রভাকর' আর কাহিনীর মতামত এ ক্ষেত্রে একেবারে ভিন্ন। ১২৬১ বঙ্গাব্দের 'সংস্বাদ প্রভাকরে'র সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছে—

> মিসনারিবর্গ কথায় কথায় বলিয়া থাকেন যে তাঁহারা প্রলোভন প্রদর্শন বা অন্য কোন হেতু প্রযুক্ত কোন ব্যক্তিকে জরডন নদীর জলে অভিষিক্ত করেন না, সকলেই ফুসমন্ত্র বাইবেলের প্রতি বিশ্বাসপূর্ব্বক ব্যাপটাইজ হইয়া থাকে। সাহেবদিগের এই বিষম ভ্রান্তি শান্তি নিমিত্ত ...।[২২]

লেখিকা কাহিনীতে এদেশীয়দের খ্রিষ্টান হওয়ার ক্ষেত্রে খ্রিষ্টবাণীর প্রতি আকর্ষণের কথা বললেও সেটির সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্রই প্রকাশিত হয়েছে তৎকালীন পত্রপত্রিকার পাতায়। এখানে দেখা যাচ্ছে, ভারতবর্ষে সাধারণ দারিদ্র্যপীড়িত মানুষদের খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার বিষয়ে লেখিকা খ্রিষ্টধর্মের মাহাত্ম্যকে বড়ো করে দেখিয়েছেন, কিন্তু তখনকার সময়ে প্রকাশিত পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত মত এ বিষয়ে একেবারেই ভিন্ন। পত্রপত্রিকায় প্রলোভনকেই দায়ী করা হয়েছে। এর মূল কারণ হিসেবে এবং এজাতীয় ধর্মান্তরের বিরুদ্ধে প্রবল সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রচেষ্টাও পত্রিকান্তরে প্রকাশিত বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বঙ্কিম-পূর্ব অন্যান্য গদ্যকাহিনীর মতো *ফুলমণি ও করুণার বিবরণে*ও তখনকার নারীজীবনের বিভিন্ন দিক চিত্রিত হয়েছে। উনিশ শতকের বাঙালিসমাজ নারী নিগ্রহের বিষয়ে বেশ সিদ্ধহস্ত ছিল। এই গদ্যকাহিনীতেও নারী নির্যাতনের চিত্র বেশ জোরালোভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। রানী নামক একটি চরিত্রের ক্ষেত্রে দেখা যায়, স্বামী ও শাশুড়ির নির্মমতা সহ্য করতে না পেরে সে স্বামীগৃহ থেকে পলায়ন করে। "রাণী পলাইয়া যাওয়াতে বড় অজ্ঞানের কর্ম্ম করিল বটে, তথাপি তাহারই সম্পূর্ণ দোষ নয়; তাহার স্বামী এবং শাশুড়ী তাহাকে যে বড় দুঃখ দেয়, তাহা আমি ভালরূপে জ্ঞাত আছি।"[২৩] পারিবারিকভাবে সংঘটিত নারী নির্যাতনের এ ধরনের চিত্র এ কাহিনীকে একটি নতুন মাত্রা দান করেছে। বঙ্কিম-পূর্ব অন্যান্য কাহিনীতে নারীর প্রতি সামাজিক নিষ্ঠুরতার প্রকাশ ঘটলেও গৃহ-নির্যাতনের কথা তেমনভাবে পরিলক্ষিত হয় না। একমাত্র এই কাহিনীতে দেখা যায়, তখনকার নারী-জীবনের এই নিষ্ঠুর দিকটির কথা লেখিকার জীবনঘনিষ্ঠ লেখনীতে উঠে এসেছে। নারীকে প্রহার করার মতো বর্বর রীতিটি লেখিকার দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। কাহিনীর আরেক জায়গায় দেখা যায়— "আমি যখন তোমার নিকট হইতে যাই তখন স্বামী কিম্বা শাশুড়ী বড় মারেন।"[২৪] এই বর্বরোচিত অভ্যাসটি তখনকার সমাজেও যে বিদ্যমান ছিল তা এজাতীয় চিত্র থেকে বেশ স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।

বাঙালির শাশুড়ি কর্তৃক বধূ নির্যাতনের প্রাচীন চিত্রটি কাহিনীতে লেখিকা পাঠকদের জানাতে ভোলেননি। কাহিনীতে এ বিষয়ে বলা হচ্ছে— "যুবতী স্ত্রীলোকেরা আপন শ্বশুর শাশুড়ী কর্তৃক অনেকবার বিরক্তা হয়, কারণ তাহারা বধূর প্রতি ক্রূর ব্যবহার করিয়া থাকে;...।"[২৫] বাঙালিসমাজে গৃহবধূর প্রতি শাশুড়ি বা ননদের বৈরী আচরণ সেই অতীত কাল থেকে বেশ প্রবল। কিংবা এটিকে সমাজের একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য হিসেবে প্রতিপন্ন করা যায়। বাঙালির সামাজিক বা মনোগত বিশ্লেষণের দ্বারা এর কারণ উদ্‌ঘাটিত হওয়ার দাবি রাখে। সেকালের নারীর প্রতি এসব বৈষম্যের ফলে সৃষ্ট নারীর অন্তর্জাত বেদনার বহিঃপ্রকাশও দেখা যায় কাহিনীতে। যেমন— "যদি ঘরের মধ্যে মিষ্ট বাক্য বলে, তবে দুইদিন অনাহারে থাকিলেও থাকা যায়; কিন্তু এইরূপ নিত্য ঝগড়া মারামারি ইত্যাদি আমি

আর সহ্য করতে পারি না। হায়! আমার মৃত্যু হইলে ভাল হয়।"[২৬] বলা যায়, নারীর মর্মবেদনাটি লেখিকা বেশ সার্থকভাবেই ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। এ ছাড়াও করুণার স্বামী কর্তৃক মদ্যপানপূর্বক তাকে লাঞ্ছিত করা এবং চরম অবহেলা প্রদান প্রভৃতির মাধ্যমে সেকালের নারী নির্যাতনের প্রকৃত চিত্রটিই উঠে এসেছে।

আমরা জানি, বাল্যবিবাহ তখনকার সময়ের একটি প্রধান সামাজিক ব্যাধি। *ফুলমণি ও করুণার বিবরণে* এই বিষয়টি উপস্থাপিত হয়েছে এভাবে— "মেয়াদের তো চৌদ্দ বৎসর না হইতে২ সর্ব্বদা বিবাহ হইতেছে;...।"[২৭] এখানে তৎকালীন খ্রিষ্টান মেয়েদের বিয়ের বয়স উল্লেখ করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, হিন্দু বা অন্য ধর্মের মেয়েদের তুলনায় খ্রিষ্টান মেয়েদের বিয়ের ক্ষেত্রে কিছুটা বিলম্ব হতো। তবে সেকালের পরিপ্রেক্ষিতের প্রভাব থেকে একেবারে মুক্ত হতে পারেনি দেশীয় খ্রিষ্টানসমাজ।

এদেশীয় নারীদের অবরোধবাস, পর্দাপ্রথা প্রভৃতি বিষয়ে সমালোচনার ভঙ্গিতে আলোকপাত করা হয়েছে কাহিনীতে। এসব বিষয়ে বলা হয়েছে— "এ দেশীয় লোকেরা কন্যাদিগকে বাটীর বাহিরে যাইতে দেয় না।"[২৮] লেখিকা এখানে যে এদেশীয় নারীদের অবরোধবাসের সমালোচনায় সচেষ্ট হয়েছেন তা বোঝা যাচ্ছে। কাহিনীতে উক্ত বিষয়ে আরো উল্লেখ আছে— "এখন পুরুষেরা যত সতী ও অসতী স্ত্রী সকলকেই বদ্ধ করিয়া রাখে, তাহাতে সতী স্ত্রীরা অবশ্য মনে নৈরাশ হইয়া বলিতে পারে, আমাদের সতী হইবার ফল কি?"[২৯] যুক্তিতর্কের মাধ্যমে অবরোধ প্রথার প্রতি এক ধরনের কটাক্ষ করা হয়েছে এই ধরনের বক্তব্য দ্বারা। কাহিনীতে নারীদের গৃহে অবস্থানের ব্যাপারে মতাদর্শগত চিন্তা প্রকাশের জন্য এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। লেখিকা এসব ব্যাপারে ইংরেজ নারীদের রীতি ও এ দেশের নারীদের রীতির একটা তুলনামূলক আলোচনাও উপস্থিত করেছেন। এদেশীয় রীতির ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়েছে—

> শ্বশুর ও ভাসুরদের প্রতি যে অত্যন্ত লজ্জা করা, ইহাও বাঙ্গালি স্ত্রীদের একটি বড় মন্দ রীতি আছে; কেননা কোন স্ত্রী পুরুষকে বিবাহ করিলে স্বামীর পিতা তাহার পিতা হয়, এবং স্বামীর ভ্রাতা তাহার ভ্রাতা হয়।[৩০]

অন্যদিকে বাঙালি নারীদের সমালোচনা করে বলা হয়েছে, "স্ত্রীলোকদের মধ্যে অনেকের কপট লজ্জা আছে, কেননা তাহারা স্বামীর ঘরে এ প্রকার ও পিতামাতার ঘরে অন্য প্রকার ব্যবহার করে।"[৩১] এসব ক্ষেত্রে ইংরেজ নারীরা যে এদেশীয়দের তুলনায় উত্তম রীতিনীতির অধিকারী তাও উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে— "বাঙ্গালি মেয়্যারা ঘোমটাদি দিয়া অন্তঃপুরে থাকে, তথাপি যত লজ্জা ইংরাজ বিবিদের মধ্যে পাওয়া যায়, তত অন্তঃপুরের মেয়্যাদের মধ্যে পাওয়া যাইবে না...।"[৩২] কিংবা আরেক জায়গায় আছে— "এদেশীয় স্ত্রীদের অন্ত ঃপুরে যে প্রকার অপবিত্র কৌতুকাদি হয়, ও যে প্রকার গালাগালি করে, সেই সকল ইংরাজ বিবিরা কখন মুখেতেও আনেন না।"[৩৩] ইংরেজ নারী ও এ দেশের নারীর তুলনা করার বিষয়টির মধ্যে লেখিকার উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব অবশ্যই অনস্বীকার্য, তথাপি তাঁর মধ্যে ইংরেজসুলভ শ্রেষ্ঠত্বের ভাবও যে বিদ্যমান ছিল, তা জোরালোভাবে বলা যায়।

পারিবারিক দায়িত্ব এবং গৃহকর্ম সেই অতীত থেকে বাঙালি নারীর জন্য একটি অমোঘ সামাজিক প্রথা হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। কাহিনীতে তৎকালের নারীদের নিত্যকার গৃহকর্ম, জীবনযাপন, আচার-ব্যবহার কিংবা রীতিনীতি প্রভৃতির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। লেখিকা মূলত খ্রিষ্টান নারীদের জীবনযাপনের বর্ণনার মাধ্যমে এসব বিষয় তুলে ধরেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এর সাহায্যে সামগ্রিক নারীজীবনের ছবিটিও আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফুলমণির সাংসারিক কর্মের বর্ণনাটি লেখিকা বেশ বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন।

সন্তানকে গোসল করানো থেকে শুরু করে কাপড় সেলাই করা— সবকিছুই লেখিকা তুলে ধরেছেন পাঠকদের সামনে। এখানে আরো দেখা যায়— "মাতা সত্যবতীর মাথায় তৈল দিয়া চুল সকল উত্তমরূপে বাঁধিয়া দিলেন। পরে উঠান ঝাঁটি দিয়া গৃহ লেপন করিতে আরম্ভ করিলেন,... ।"[৩৪] সাংসারিক কর্মবিষয়ক এজাতীয় বর্ণনায় লেখিকার নিখুঁত পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার পরিচয় মেলে। ঘরকন্নার ছোটখাটো অনুষঙ্গও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি।

সেকালের গ্রামীণ নিম্নবিত্তের মানুষের জীবিকা নির্বাহ বিষয়ে কিছু তথ্য পাওয়া যায় কাহিনীতে। গরু পালন এবং দুগ্ধ বিক্রয় যে তখনকার বাঙালি জীবনে একটি অপরিহার্য আয়ের উৎস ছিল তা দেখা যায় কাহিনীবর্ণিত বিভিন্ন চিত্রে। কাহিনীতে, ফুলমণির গরু পালনের ব্যয় বহন করেও দুধ বিক্রয় করে মাসে দুই টাকা আয় করার কথা উল্লেখ আছে।[৩৫] এ ছাড়াও সম্পন্ন পরিবারের গৃহকাজে সাহায্য করেও তখন নিম্নবিত্ত পরিবারভুক্ত নারীরা অনেকে উপার্জন করত, জানা যায়। যেমন—

> আমাদের পাড়াতে কোন ২ ধনি স্ত্রীলোকেরা সপ্তাহের মধ্যে একবার চারিটি পয়সা দিয়া পরের দ্বারা ঘর লেপিয়া লন।...সপ্তাহ গেলে চারি ঘরে যদি চারি আনা পাই, তবে স্বচ্ছন্দে মাসে এক টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিব।[৩৬]

গৃহকাজে সাহায্য করে কী পরিমাণ উপার্জন হতো এখানে সেটিও উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রামের অধিকাংশ পরিবারেই যে দরিদ্রতার অভিশাপ জাঁকিয়ে বসেছিল তা অনুমান করা অসম্ভব নয়। কলকাতার মতো শহরগুলোতে ধনবাদের উন্মেষ ঘটলেও আর্থসামাজিক দিক থেকে গ্রামবাংলা ছিল অবহেলিত। ফলে বেঁচে থাকার সংস্থানের জন্য গ্রামের অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্নদের গৃহে অনেকটা ভৃত্যের কাজ করতে হত অনেক নারীকে। বলা যায়, গ্রামাঞ্চল এই মুল্লুকে চিরকালই অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে থেকেছে। অদ্যাবধি এ দেশে বিত্ত কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে শহরাঞ্চলে। জীবনমানের দিক থেকে গ্রাম আর শহরের মধ্যে বিরাজ করছে বিস্তর ফারাক।

ইংরেজদের গৃহে বেহারা ও খানসামার কাজ এদেশীয়দের দ্বারাই নিষ্পন্ন হত। যেমন, কাহিনীতে দেখা যায়, মেম সাহেব তার বাড়িতে করুণার দুই পুত্রকে 'বেহারার এবং খানসামার' কাজ শেখানোর জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে।[৩৭] এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, ইংরেজদের গৃহে সামান্য চাকরবাকরের কাজ করাকেও এদেশীয়রা সেকালে সৌভাগ্যের বিষয় মনে করত। রাজশক্তির কাছাকাছি অবস্থান সাধারণ মানুষদের অর্থনৈতিকভাবে তো বটেই, সামাজিকভাবেও এক ধরনের সুবিধাজনক অবস্থানে নিয়ে যেত। ঔপনিবেশিক আমলে ইংরেজদের গৃহে নিয়োজিত ভৃত্যরা সাধারণ প্রজাদের চেয়ে অধিকতর প্রতিপত্তি ভোগ করত।

বাজারে মাছ বিক্রয়ের একটি চিত্রও কাহিনীতে পরিলক্ষিত হয়— "এখন বেলা গেল বটে, তথাপি বোধ করি শীঘ্র বাজারে গেলে কিছু মাছ পাইতে পারিবা,... ।"[৩৮] এজাতীয় ছোটখাটো বর্ণনায় ম্যলেন্স বেশ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন কাহিনীর বিভিন্ন অংশে। এটি এ দেশের মানুষের পারিবারিক, সামাজিক প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গে তাঁর জীবনঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বিষয়টিকেই স্পষ্ট করে তোলে।

ফুলমণি ও করুণার বিবরণে কিছু ক্ষেত্রে কাহিনীর প্রয়োজনে সেকালের চিকিৎসক, শিক্ষক প্রভৃতি সম্মানজনক পেশা বৃত্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কাহিনীতে প্যারী নামক একজন ধর্মান্তরিত মহিলার বিষয়ে অবগত হয়ে একজন ইংরেজ চিকিৎসক তাকে চিকিৎসা প্রদান করে।[৩৯] সেই সময় ইংরেজ চিকিৎসকরা যে এদেশীয়দের চিকিৎসা প্রদান করতেন, সে তথ্য অন্যান্য কাহিনীতেও পাওয়া যায়।

কাহিনীতে তখনকার শিক্ষক, চিকিৎসক প্রভৃতি পেশার লোকদের আয়ের বিষয়টিও তুলে ধরা হয়েছে। যেমন, একজন 'ইংরাজ স্কুলের প্রধান শিক্ষকে'র বেতন উল্লেখ করা হয়েছে মাসিক 'পঁচিশ টাকা'।[৪০] আর চিকিৎসকের আয় সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'কোম্পানির কোন ডাক্তারখানায় প্রধান চিকিৎসক' হতে পারলে মাসে 'দেড়শত টাকা' উপার্জন করা যায়।[৪১] ঔপনিবেশিক আমলেও যে চিকিৎসা পেশা থেকে মোটা অঙ্কের আয় হত এখানে সেটি বোঝা যাচ্ছে।[৪২] বাস্তবিকই তখন যে ডাক্তারি বেশ সৌভাগ্যজনক পেশা ছিল তা জানা যায় ১২৬১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'সম্বাদ প্রভাকর' থেকে। পত্রিকাটি ডাক্তারি বিদ্যা বিষয়ে লিখেছে— "মেডিকেল বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইলে অনায়াসে গবর্ণমেন্ট সংক্রান্ত কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া অথবা অন্যকোন কার্য্যান্তর চেষ্টা দ্বারা সৌভাগ্য সঞ্চয় করিবেন।"[৪৩] এই কাহিনীতে বিবৃত চিকিৎসাবিদ্যা-বিষয়ক চিত্রটি যে বাস্তবতার প্রেক্ষাপটেই তুলে আনা হয়েছে সেটি 'সম্বাদ প্রভাকর'-এ প্রকাশিত তথ্যের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে সহজেই।

কৌতূহলী হওয়ার মতো আরো একটা ব্যাপার দেখা যায় কাহিনীতে— তৎকালীন তেলের দামবিষয়ক তথ্য প্রকাশের দ্বারা। কাহিনীতে দেখা যায়, একজন গৃহভৃত্য দশ টাকা মণ দরের তেল কিনতে গিয়ে পাঁচ টাকা চুরি করেছে।[৪৪] তখনকার গৃহভৃত্যের এরূপ চৌর্যকর্ম দ্বারা এদেশীয় নিম্নশ্রেণীর নীতিহীনতার বিষয়টি প্রকাশ পাচ্ছে নিঃসন্দেহে।

চিকিৎসা সর্বকালেই মানুষের জন্য একটি অপরিহার্য বিষয়। *ফুলমণি ও করুণার বিবরণে* তখনকার প্রেক্ষাপটে চিকিৎসাপদ্ধতির বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়েছে। কাহিনীতে দেখা যায়, সেকালে এদেশীয় কবিরাজরা রোগ উপশম না হওয়া পর্যন্ত রোগীকে প্রাত্যহিকভাবে পরিচর্যা করত। আর তাদের সম্মানীর ক্ষেত্রে দেখা যায়, ছয় মাস পর্যন্ত চিকিৎসা প্রদানের সম্মানী হিসেবে জনৈক কবিরাজ চব্বিশ টাকা দাবি করছে।[৪৫] রোগ নিরাময়ের নিমিত্ত কবিরাজের ছয় মাস একনাগাড়ে চিকিৎসা প্রদান ও তাঁর সম্মানীর অঙ্ক প্রভৃতি একালের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত কৌতূহলজনক বিষয়, সন্দেহ নেই।

মহামারী বা সংক্রামক রোগব্যাধি ছিল সেকালে অত্যন্ত ভয়ানক প্রাণনাশী।[৪৬] গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে যেত এ রকম রোগাক্রান্তের ফলে। কাহিনীতে 'উলাউঠা' রোগের কথা

লিপিবদ্ধ আছে। ওলাউঠা কিংবা কলেরা রোগটি সম্পর্কে জানা যায়, ১৮১৭ সালের আগে কলেরার প্রকোপ খুব ভয়াবহ ছিল না। রোগটির এই ভয়াবহ প্রকোপ সর্বপ্রথম পরিলক্ষিত হয় যশোরে ২০ আগস্ট ১৮১৭ তারিখে। ২০ থেকে ২২ আগস্টের মধ্যে রোগটির ভয়াবহতায় শহর প্রায় জনশূন্য হয়ে যায়।[৪৭]

রোগের পরিচর্যার ক্ষেত্রে এ দেশের সঙ্গে ইংরেজদের রীতির একটা তুলনামূলক চিত্র হাজির করার প্রয়াস পেয়েছেন লেখিকা। এ বিষয়টিকে কাহিনীতে এ দেশে চিকিৎসাপদ্ধতির আধুনিকতা আনয়নের প্রয়োজনীয়তার ওপর ভিত্তি করে তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষত, পল্লি অঞ্চলে তখন রোগ পরিচর্যার বিষয়ে এক ধরনের অজ্ঞানতা ছিল। পীড়িত লোকের ক্ষেত্রে দুই দেশের সামাজিক রীতির তুলনা করে কাহিনীতে বলা হয়েছে—

> বাঙ্গালা দেশস্থ লোকদের পীড়া হইলে যদি বাহিরের কোন মানুষ আসিয়া তাহাদের নিকটে বৈসে, ও হাতাগের দুঃখে দুঃখিত হয়, তবে তাহারা বড় সন্তুষ্ট হয়। বিলাতে এমত নয় বটে, বরং সেখানে যদি কোন অপরিচিত ব্যক্তি হঠাৎ গিয়া রোগগ্রস্ত মানুষের নিকটে উপস্থিত হয়, তবে সেই পীড়িত ব্যক্তির বন্ধু বান্ধবেরা তাহাকে অশিষ্ট লোক জ্ঞান করে।[৪৮]

লেখিকা ইউরোপীয় ছিলেন বলেই হয়ত বিভিন্ন বিষয়কে উপলক্ষ করে এদেশীয় এবং ইউরোপীয় সমাজের তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপনের কাজটি বেশ সাবলীলভাবে করতে পেরেছিলেন। দুটি সমাজই তাঁর কাছে সমানভাবে পরিচিত ছিল। এটিকে কাহিনীর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

গর্ভকালীন অপচিকিৎসার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে— "বাঙ্গালি স্ত্রীলোকদের ছেল্যারা অনেকবার ধাইদের অজ্ঞানতা প্রযুক্ত গর্ভে নষ্ট হয়, তাহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।"[৪৯] অপচিকিৎসা বিষয়ে স্বচক্ষে দেখা ঘটনারই বয়ান দিয়েছেন লেখিকা এখানে। কাহিনীতে বর্ণিত অপচিকিৎসার চিত্রটি যে সঠিক তা সেকালের পত্রিকার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে বোধগম্য হয়। ১৮৩৯ সালের 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় গ্রামাঞ্চলের মানুষদের আধুনিক বা ইউরোপীয় চিকিৎসার প্রতি অনীহাকে নির্দেশ করে লেখা হয়েছে— "মফঃসলের প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি বলি যে তত্রস্থ যে কোন ব্যক্তি একবার এই মহানগরের চিকিৎসালয়ের ফল সংদর্শন করিয়াছেন তাহারদিগের অন্তঃকরণে বিলক্ষণ দৃঢ়তা জন্মিয়াছে...।"[৫০] আধুনিক অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার ক্ষেত্রে গ্রামের মানুষকে অভয় দান করার সাক্ষ্য বহন করছে পত্রিকায় প্রকাশিত বক্তব্যটি। চিকিৎসার আধুনিক পদ্ধতির সুফল সাধারণ মানুষকে অবগত করানোর প্রচেষ্টাটি তৎকালীন পত্রপত্রিকার একটি উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক দৃষ্টান্ত হিসেবে পরিগণিত হতে পারে।

সেকালের অপরাধ-সম্পর্কিত কিছু চিত্র লক্ষিত হয় কাহিনীতে। বোঝা যায়, এ দেশের চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে লেখিকার বাস্তব পরিচয় ছিল। গৃহভৃত্যদের দ্বারা সংঘটিত ছোটখাটো চৌর্যবৃত্তির বিষয়ে লেখিকা বেশ ভালোভাবেই অবহিত ছিলেন; অন্তত কাহিনীপাঠে সেরকম ধারণা করাটা সংগত। এ ছাড়াও জুয়াখেলার কুফল সম্পর্কে এক জায়গায় বলা হচ্ছে— "জুয়া খেলা অপেক্ষা টাকা উপার্জন করিবার

অন্যান্য ভাল উপায় আছে।"[৫১] এই জুয়া খেলা বিষয়ে ১৮৩৭ সালে প্রকাশিত 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় লেখা হয়েছে— "জুয়া খেলা নিমিত্ত যে মহা ক্ষতি তাহা অতি দূর২ দেশের মধ্যেও বিস্তার হইয়া থাকে। ঐ মহাপাপ স্থানে প্রতি বৎসরে লক্ষ২ টাকা অপহৃত হওয়াতে শত২ বংশ একেবারে জন্মের মত দরিদ্র হইয়া যায়।"[৫২] সুতরাং বলা যায়, জুয়া খেলার মতো প্রবল সামাজিক সমস্যাটি লেখিকা একজন সমাজহিতৈষীর মতো কাহিনীতে যুক্তিযুক্তভাবেই তুলে ধরেছেন। এটিকে সমকাল সম্পর্কে লেখিকার বাস্তব জ্ঞানের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে বিবেচনায় আনা যেতে পারে।

সেকালে বাংলাদেশে চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি অপরাধ বেশ বিস্তার লাভ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে চৌর্যবৃত্তি ও দস্যুবৃত্তি এ দেশে অনেকটা প্রাচীন। উনিশ শতকের ব্রিটিশ রাজত্বে এসব অপরাধ সম্বন্ধে ১২৫৮ সালের 'সম্বাদ প্রভাকর' লিখেছে—

> সংপ্রতি পল্লীগ্রামের নানা স্থানে চৌর্য্যকার্য্যের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, আমারদিগের কোন সংবাদদাতা দ্বারা অবগত হইলাম দস্যুরা কিঞ্চিৎ সুযোগ পাইলে গৃহস্থের যথাসর্ব্বস্বাপহরণ পূর্ব্বক প্রস্থান করে, তদ্ব্যতীত কৃষকদিগের পরিশ্রম জাত শস্যাদি কাহারো বা বাটী হইতে কাহারো বা ক্ষেত্র হইতে লইয়া যাইতেছে,... ।[৫৩]

চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি অপরাধের প্রাদুর্ভাবের ফলে গৃহচুরির পাশাপাশি কৃষকদের উৎপন্ন শস্যাদিও কখনো বাড়ি থেকে কখনো বা ক্ষেত থেকে চুরি যেত। এ কাহিনীতে চৌর্যকর্ম বা এজাতীয় অপরাধের বর্ণনাগুলো সে যুগের একটি মৌল সমস্যা হিসেবেই চিত্রিত হয়েছে, তা সেকালে প্রকাশিত পত্রিকার খবরের সাহায্যে ভালোভাবেই বোধগম্য হয়।

কাহিনীতে অপরাধবিষয়ক চিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হলো, করুণার পুত্র বংশীর চুরি করতে গিয়ে মৃত্যুবরণের দৃশ্যটি। এর মাধ্যমে আমরা সেকালে সিঁদ কেটে চুরি করার একটি চিত্র দেখতে পাই। কাহিনীতে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ঘটনাটি বর্ণনা করা হয়েছে। ঘটনাটি এরকম, একজন হিন্দুলোক করুণার ছেলে বংশীকে নিয়ে রাতের বেলায় জনৈক মহেন্দ্র বাবুর গৃহে সিঁধ কেটে প্রবেশ করে।[৫৪] এরপর তারা— "দুই জনে প্রবেশ করিয়া বাবুর স্ত্রীর সকল গহনা খুলিতে লাগিল।"[৫৫] ইতোমধ্যে মহেন্দ্র বাবুর স্ত্রী টের পেয়ে চিৎকার করলে চোরেরা তার 'কুক্ষিদেশে আঘাত' করে। এই সময় বাবু জেগে উঠে চোরদের ধরার চেষ্টা করলে তারা পালিয়ে যায়। করুণার ছেলে বংশী পালাতে গিয়ে পুকুরে ডুবে মরে। আর অন্যদিকে, "অন্য চোরও পাকা ঘাটের শিঁড়িতে আছাড় খাইয়া পড়িল, তাহাতে বাবু তখনি তাহাকে ধরিলেন;"[৫৬] এর পরের ঘটনা একজন বরকন্দাজের বিবরণে এরকম—

> তাহাকে একবার মাজিস্ট্রেট সাহেবের সাক্ষাতে লইয়া যাইতে হইবে। আমরা যে চোরকে থানায় রাখিয়াছি, যদি সাহেব তাহাকে একেবারে ফাঁসি দিতে আজ্ঞা দেন তবে বড় ভাল হয়; কেননা সে একবার পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত কয়েদ ছিল, তথাপি সে কোন প্রকারে শিক্ষা পায় নাই।[৫৭]

এসব বর্ণনার দ্বারা সে সময়কার অপরাধ, থানা, বিচার প্রভৃতির ধারণা পাওয়া যাচ্ছে। চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি অপরাধের দৃশ্য নির্মাণে হান্না ক্যাথেরিনের বাস্তব জ্ঞান সত্যিকারভাবেই

প্রশংসার দাবি রাখে। উল্লিখিত চৌর্যকর্মের বর্ণনা ছাড়াও তখনকার সামাজিক প্রেক্ষাপটে নিতান্ত অল্প বয়সে অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠার কথা উল্লেখ করা হয়েছে কাহিনীতে। "তাহার বয়স পোনের কিংবা ষোল বৎসরের অধিক ছিল না, তথাচ সে কেমন দুষ্ট ও লম্পট বালক, ইহা তাহার মুখ ও আচার ব্যবহার দ্বারা অতি স্পষ্ট বোধ হইল।"[৫৮] এরকম অল্প বয়সে নানা রকম অপরাধে জড়িয়ে পড়ার প্রবণতা যে এখনকার মতো সেই সময়েও বিদ্যমান ছিল সেটি এজাতীয় চিত্র থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সেকালের পান, তামাক প্রভৃতির কথাও পাওয়া যায় কাহিনীচিত্রে। বিশেষ করে, মেয়েদের তামাক খাওয়ার রীতিটি যে প্রচলিত ছিল তা জানা যায়। 'করুণা' নামক চরিত্রের জবানিতে আছে— "মেম সাহেব, আপনি যে পয়সাটি দিয়াছিলেন, তাহাতে পান তামুক কিনিয়া আনিলাম। কাপড়ের দুই এক দিন বিলম্ব হইলে ক্ষতি নাই; কিন্তু আমরা তামাক না খাইলে মারা পড়ি।"[৫৯] সেকালের নিম্নবিত্ত নারীদের এজাতীয় তামাক-আসক্তি স্বাভাবিক বিষয় ছিল বলেই মনে হয়। একালেও স্বল্প-আয়ের মানুষ কিংবা শ্রমজীবীদের মধ্যে নারীরা বিড়ি বা তামাক প্রভৃতি নেশায় আসক্ত।

পরিবারের মধ্যে বিনোদনের জন্য গান গাওয়ার চল ছিল, কাহিনীর বিভিন্ন দৃশ্যের মাধ্যমে তা অবলোকন করা যায়। যেমন— "শনিবারে সন্ধ্যাকালে মাতার তাবৎ কর্ম্ম সাঙ্গ হইলে পর; আমরা সকলে বসিয়া কএকটি গান গাই।"[৬০] সংগীত বা গানবাজনা সর্বকালেই মানুষের বিনোদনের অপরিহার্য এবং উৎকৃষ্ট উপকরণ। এই কাহিনীতেও সেটির খোঁজ পাওয়া যায়। দেখা যাচ্ছে, পারিবারিক বিনোদনের ক্ষুদ্র অথচ নির্মল উপাদানের কথাও কাহিনীতে লেখিকা সন্নিবেশ করতে ভোলেননি।

ফুলমণি ও করুণার বিবরণে লেখিকা এদেশীয় বাঙালি খ্রিষ্টানদের পারিবারিক জীবনের নানা প্রাত্যহিক অনুষঙ্গ যেমন রান্নাবান্না, খাদ্যসামগ্রী, আহার প্রভৃতির চিত্র তুলে ধরেছেন। নিম্নবিত্ত বাঙালির খাদ্য-তালিকায় তখনো মাছই প্রধান ছিল। রান্নাবিষয়ক একটি বর্ণনায় দেখা যায়— "চড়চড়ি রন্ধন করিবার নিমিত্তে কিছু তৈল তোমার নিকটে চাহিতে আসিয়াছি...আমার পুত্র এখনি কতকগুলিন চুনা মাছ ধরিয়া আনিয়া দিল, সেইগুলিন এই বেলার মত রন্ধন করিব।"[৬১] তবে অতিরিক্ত দরিদ্রতাহেতু দিনের পর দিন কেবল শাকান্ন খেয়েই জীবন ধারণ করতে হতো, তাও লেখা আছে কাহিনীতে। ফুলমণির স্বামী অসুস্থ হলে তাদের পরিবারে দারিদ্র্য নেমে আসে। তার ফলস্বরূপ পরিবারে যে দুর্দশা ঘটে সে বিষয়ে ফুলমণি বলছে, "আমরা ঐ ছয় মাসের মধ্যে কেবল অন্ন ও শাক বিনা আর কোন ভাল দ্রব্য এক দিবসও খাইতে পাইতাম না;"[৬২] আর অতিথি আপ্যায়নের জন্য সপ্তাহে এক দিন অর্থাৎ শনিবার দিন মাছ-মাংস রান্না করতে দেখা যায় ফুলমণির পরিবারকে।[৬৩] লেখিকা যে খুব কাছ থেকে বাঙালি-জীবনকে অবলোকন করেছিলেন তা গ্রামীণ জীবনের একেবারে অভ্যন্তরের চিত্রবর্ণন থেকে বোধগম্য হয়। আহারের আরেকটি দৃশ্য এরকম— "একটা মাদুর দাবায় বিছাইয়া তাহাকে ইলিস মাছের ব্যঞ্জন ও ভাল অম্ল ও ভাত আনিয়া দিলাম। সে তাহা দেখিয়া বড় আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া কহিল, করুণা...এমত ভাল খাওয়া

তিন মাস পর্য্যন্ত পাই নাই;"[৬৪] ইলিশ মাছ যে তখনো একটি উপাদেয় খাদ্য হিসেবে প্রচলিত ছিল হতদরিদ্র মানুষদের কাছে, সেটি জানা যাচ্ছে।

বস্তুতপক্ষে তখনকার সমাজে সাধারণ গ্রাম্য মানুষের অভাবগ্রস্ততা বেশ চরমে ছিল। গ্রামীণ কৃষক তথা গ্রামের সাধারণ মানুষের দরিদ্রতা প্রযুক্ত আহারের বিষয়ে সে সময়ে প্রকাশিত 'সম্বাদ প্রভাকরে' (২০.৮.১৮৫৭) জানিয়েছে যে, কৃষকরা 'অসিদ্ধান্ন ও সামান্য শাকাদি' খেয়েই তৃপ্ত হয়, যে দিন 'মৎস্য পায়' সেদিন তারা অপরিসীম আনন্দ লাভ করে।[৬৫] এই তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, গ্রামীণ দরিদ্র জীবনকে লেখিকা যথার্থভাবেই কাহিনীতে তুলে এনেছেন। পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের সঙ্গে কাহিনীর আহারের বর্ণনাটি যথেষ্ট সংগতিপূর্ণ।

সে সময়কার সমাজে গ্রামদেশের দরিদ্রদের পোশাকের তেমন কোনো বিলাসিতা ছিল না। স্বল্পমূল্যের পোশাকও অনেকে অভাবহেতু কিনতে অক্ষম ছিল। তখনকার দরিদ্র মানুষের জীবনযাপন বিষয়ে 'সম্বাদ প্রভাকরে'র (২০.৮.১৮৫৭) ভাষ্য হলো, "কটি দেশে ছিন্ন বস্ত্রমাত্র অবলম্বন ও দর্ম্মামাদুরি এবং তৃণের বালিশই তাহারদিগের কোমল শয্যা হইয়াছে,... ।"[৬৬] এ থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, অতি প্রয়োজনীয় বস্ত্র পরিধানও অনেক ক্ষেত্রে তখনকার গ্রাম্য নিম্নবিত্তজীবী মানুষের সাধ্যের মধ্যে ছিল না। কাহিনীর একটি অংশে সেকালের পোশাকের দাম সম্পর্কে জানা যায় যে, 'দুই আনা পয়সাতে' একটি 'কোর্ত্তার কাপড়' কেনা যেত, লেখিকার বিবেচনায় যা খুব একটা দামি নয়।[৬৭] অন্যদিকে শাড়ির মূল্য বা দাম সম্পর্কে অবগত হওয়া যায় এভাবে, "নবীনের বাপ আমাকে এই শাড়ি খানি কিনিয়া দিয়াছে। ইহার মূল্য চারি টাকা,... ।"[৬৮] আর এই চার টাকা দামের শাড়িও অভাবীদের কেনা অসাধ্য ছিল তা করুণার বস্ত্রবিষয়ক দুরবস্থা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তখনকার দিনে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জামাকাপড় মেয়েরা ঘরেই সেলাই করত বলে কাহিনীতে উল্লেখ আছে। অন্যদিকে ইংরেজদের গৃহে খানসামা প্রভৃতি পেশায় নিয়োজিতদের পোশাকের ক্ষেত্রে পাগড়ি, চাপকান ও পায়জামার কথা বলা হয়েছে।[৬৯]

সাংসারিক ব্যয় পরিকল্পনার একটি চিত্র কাহিনীতে তুলে ধরার ক্ষেত্রে লেখিকার এক ধরনের উপদেশাত্মক মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। প্রেমচাঁদ ও ফুলমণির সংসারের ব্যয় নির্বাহের নিমিত্তে যে পরিকল্পনার সন্ধান পাওয়া যায়, সেটির মাধ্যমে আমরা তখনকার দিনের একটি সংসারের মাসিক ব্যয়ের চমৎকার লেখ্যচিত্র লাভ করি। এই সাংসারিক আয়-ব্যয়ের কথোপকথনের অবতারণা করে ফুলমণি বলছে, "আমার স্বামী আজি মাহিনা পাইয়াছেন, অতএব আগত মাসে আমরা কি প্রকারে তাহা ভালরূপে খরচ করিতে পারি, ইহাই বিবেচনা করিতেছিলাম।"[৭০] এরপর পর্যায়ক্রমে প্রেমচাঁদ (ফুলমণির স্বামী) ও ফুলমণি দুজনে মিলে সংসারের ব্যয়নির্বাহের হিসেব-নিকেশ করতে থাকে। প্রেমচাঁদের মাসিক বেতন সাত টাকার মধ্যে এক টাকা জমা করার পর আর ছয় টাকা সে স্ত্রী ফুলমণির হাতে এনে দেয়। অন্যদিকে ফুলমণিও দুধ বিক্রি করে তিন টাকা বারো আনা রোজগার করে। সব মিলিয়ে দেখা যায় তাদের আয় হয়েছে নয় টাকা দশ আনা। তার মধ্য থেকে

তারা স্বামী-স্ত্রী মিলে বিভিন্ন প্রকার ব্যয় নির্বাহের সিদ্ধান্ত নেয়। এসব খরচের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— "করুণার শাড়ির জন্য দশ আনা, প্রভুর ভোজনের নিমিত্তে দুই আনা, মিশনারি সোসাইটির মাসিক চাঁদার নিমিত্তে দুই আনা... ।"[৭১] ইত্যাদি।

ফুলমণি ও করুণার বিবরণে তৎকালে প্রচলিত বিভিন্ন লৌকিক সংস্কার বা কুসংস্কারের[৭২] কথা বিবৃত হয়েছে। মধু নামক চরিত্রের মৃত্যুর ক্ষেত্রে যেমন একজন গ্রাম্য প্রবীণ মহিলা বলেন— "কবিরাজ রোগ তো দমন করিয়াছিল, কিন্তু মেম সাহেব সেথায় থাকাতে ঝাড় ফোঁক কিছু করা গেল না, এই জন্যে ভূত তাহাকে চাপিয়া মারিল।"[৭৩] এর বাইরেও দেখা যায়, গর্ভবতী মহিলা যদি কোনো পেঁচা বা পাখি দর্শন করে, তবে ঐ পাখি ফিরে না আসা পর্যন্ত মহিলার প্রসব হবে না, এজাতীয় সংস্কার এদেশীয়দের মনে বদ্ধমূল ছিল। অন্যদিকে আঁতুড়ঘরে জুতা, ঝাঁটা প্রভৃতি টাঙিয়ে রাখার চল ছিল বলে কাহিনীতে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন—

> আমি যেন পুনর্ব্বার এই স্থানে আইলে প্রসব গৃহে লোহা কিম্বা জুতা কিম্বা ঝাঁটা ইত্যাদি টাঙ্গান না দেখিতে পাই। আর ভূতের ভয় ত্যাগ করিয়া রাণিকে ও তাহার মেয়্যাটিকে অতিশয় যত্নপূর্ব্বক রাখিবা।[৭৪]

দেখা যাচ্ছে, সে সময়ে এদেশীয় খ্রিষ্টানদের মধ্যেও বাঙালিসমাজে প্রচলিত লৌকিক সংস্কারগুলো বিদ্যমান ছিল। মূলত এদেশীয়রা উনিশ শতকে নানা কারণে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করলেও স্বভূমির আচার, কৃষ্টি কিংবা রীতিনীতি ত্যাগ করেনি। *ফুলমণি ও করুণার বিবরণে* এ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়। কেবল ধর্মীয় আচারের ক্ষেত্রেই কাহিনীতে বর্ণিত দেশীয় খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়, এর বাইরে জীবনযাপন প্রণালী কিংবা লৌকিক সংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে তাদের মধ্যে খাঁটি দেশজ ধারাই খুঁজে পাই আমরা।

কেউ মারা গেলে বাঙালিদের মধ্যে বিলাপ বা জোরে সুর ধরে কান্নাকাটি করার বিষয়টিও কাহিনীতে স্থান পেয়েছে।[৭৫] লেখিকা সমালোচনার মনেবৃত্তি নিয়ে এর উল্লেখ করলেও শোকাতুরা হয়ে এরূপ ক্রন্দনের ঘটনা বাঙালির চিরন্তন আবেগেরই একটি বহিঃপ্রকাশ।

ফুলমণির কন্যা সুন্দরীর বিয়ের মাধ্যমে কাহিনীতে আমরা তৎকালীন খ্রিষ্টানসমাজের বিয়ের চিত্রটি পাই। কাহিনীতে দেখা যায়, এদেশীয় খ্রিষ্টানদের মধ্যে তখন দেশীয় কৃষ্টি এবং ইউরোপীয় রীতির সংমিশ্রণ ছিল বিয়ে বা এ রকম বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে। বিয়ে উপলক্ষে পাত্রী দেখার একটি চিত্র পাওয়া যায় ফুলমণির কন্যা সুন্দরীকে পাত্রের সঙ্গে পরিচিত করানোর জন্য নিজেদের গৃহে ভোজের নিমন্ত্রণ করার মধ্য দিয়ে।[৭৬] বিয়ে-পূর্ব পরিচয় কিংবা জানাশোনার বিষয়ে লেখিকা ইংরেজদের সঙ্গে বাঙালিদের তুলনা করে বলেন, বাঙালি মেয়েরা ইংরাজদের মতো বিয়ের আগে তাদের হবু বরের সাথে আলাপ করতে পারে না, ফলে যার সাথে বিয়ে হতে যাচ্ছে তার মনোভাবও বুঝতে সক্ষম হয় না।[৭৭] আমরা জানি যে, বিয়ের বিষয়ে এ দেশের মেয়েদের মতামতকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রাহ্য করেন না পিতামাতারা। উনিশ শতকের সমাজে যে এটি অনিবার্য রীতি ছিল তা স্বাভাবিকভাবেই বলা যায়।

বিয়ের ভোজ বাঙালি সমাজজীবনের একটি প্রাচীন এবং অপরিহার্য উপাদান। আমাদের আলোচ্য কাহিনীতেও এ রকম একটি ভোজানুষ্ঠান দৃশ্যমান হয়। একালের সঙ্গে সেকালের ভোজরীতির অনেকটা সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় এ ধরনের চিত্রে। যেমন—

> বিবাহের দিন উপস্থিত হইলে পাড়ার মধ্যে কোন পরিষ্কার স্থানে একটি বৃহৎ লাল ও শাদা কাপড়ের চন্দ্রাতপ টাঙ্গান গেল, এবং ভূমিতে বিছাইবার জন্যে আমি কএকটি শপ পাঠাইয়া দিলাম। ফুলমণির সন্তানেরা ছোট নবীনকে সঙ্গে করিয়া সুদৃশ্য ফুল ও পাতার হার গাঁথিয়া ঐ চন্দ্রাতপের চতুস্পার্শে টাঙ্গাইয়া দিল।[৭৮]

এ রকম ভোজের চিত্র আমাদের গ্রামদেশে এখনো সচরাচর চোখে পড়ে। উন্মুক্ত স্থানে শামিয়ানা টাঙানো, ফুল দিয়ে ভোজের স্থান সাজানো— এখনো এ দেশে অনেকাংশে প্রচলিত আছে।

সেকালে বাঙালিসমাজে সাধারণ পরিবারে আসবাবের তেমন কোনো বাহুল্য ছিল না। সে কারণেই বোধ হয় সাধারণ পরিবারের চিত্র বর্ণনায় কাহিনীতে খুব অল্প পরিমাণ আসবাব প্রভৃতির দেখা পাওয়া যায়। তখনকার গ্রামদেশের আসবাবপত্রের ক্ষেত্রে, পিঁড়ি, মোড়া প্রভৃতি বস্তু ছাড়া তেমন কোনো বিলাসবহুল জিনিসের সন্ধান পাওয়া যায় না। মোড়ার ক্ষেত্রে কাহিনীতে দেখা যায়, করুণা মেমসাহেবকে বলছে যে, সে 'চারি পয়সা দিয়া' একটি নতুন মোড়া ক্রয় করেছে, যেন উক্ত মেমসাহেব তার বাড়িতে এলে তাঁকে সে বসতে দিতে পারে।[৭৯] সামান্য চার পয়সা দামের মোড়াও তখনকার সময়ে অনেক দরিদ্র পরিবারের পক্ষে কেনা দুঃসাধ্য ছিল। এ ধরনের বর্ণনার সাহায্যে সেকালের সাধারণ পরিবারের দরিদ্রতার মাত্রাটি খুব সহজেই বোধগম্য হয়।

সাধারণ গ্রাম্য দরিদ্র নিম্ন জীবনযাত্রার বিপরীতে এ দেশের শাসক ইংরেজগোষ্ঠীর জীবনযাপন ছিল বেশ উন্নত মানের এবং বিলাসিতাময়। কাহিনীতে আছে— "আমার মেজের উপর বড় একখানা আর্শি দেখিয়া তাহারা দুইজনে অত্যন্ত আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল, কারণ পূর্ব্বে তাহারা এমন বস্তু কখন দেখে নাই।"[৮০] ইংরেজদের বিলাসময় জীবনযাপন যে এ দেশের মানুষের বিস্ময় উৎপাদন করত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষিতশ্রেণির অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলটুকু নিজেদের অধিকারে নিয়ে ইংরেজ শাসকরা তাদের জীবনযাপনকে আরাম-আয়েশে ভরপুর করেছিল। পক্ষান্তরে, দেশের সাধারণ মানুষ অনেক ক্ষেত্রে বেঁচে থাকার ন্যূনতম চাহিদা পূরণেও ছিল অক্ষম। শাসকগোষ্ঠীর বিভিন্ন প্রকারের শোষণের ফলেই যে এমনটি ঘটে তা বলা যায় নিঃসংশয়ে।

ফুলমণি ও করুণার বিবরণের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এখানে বিধৃত হয়েছে একজন ইউরোপীয় মহিলার পর্যবেক্ষণকৃত সমাজের চিত্র। এ কারণে কাহিনীতে নারীমুক্তির একটা প্রচ্ছন্ন ছাপ প্রত্যক্ষ করা যায়। এই বিষয়গুলো সমকালীন অন্যান্য রচনা থেকে এ কাহিনীটিকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। কাহিনীতে তৎকালীন বঙ্গসমাজকে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে লেখিকা হান্না ক্যাথেরিনের মধ্যে কোনো ধরনের আড়ষ্টতা কাজ করেনি। হান্না ক্যাথেরিন ম্যালেন্স এ গদ্যকাহিনীতে উনিশ শতকের বাঙালি খ্রিষ্টানসমাজের নিখুঁত ও বিস্তারিত চিত্র উপস্থাপন করেছেন।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. হান্না ক্যাথেরিন ম্যলেন্স, *ফুলমণি ও করুণার বিবরণ*, সংগ্রহ ও সম্পাদনা : বকুল রোজারিও, (ঢাকা, কথাপ্রকাশ তৃতীয় সংস্করণ, একুশে বইমেলা, ফেব্রুয়ারি ২০০৯), পৃ. ১২৫

২. *ফুলমণি ও করুণার বিবরণ* সম্পর্কে লেখিকার বোন লিখেছেন—

"...this book she desired to present to her readers a picture of a Christian and an unchristian family: to display and argue against various forms of evil existing in the native communities; and so commend to them the excellence of Christian principle in the holy life and happy death of its sincere discipline. This plan was carried out in the form of a story, most simply, but most graphically told."

—*ফুলমণি ও করুণার বিবরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭

৩. *ফুলমণি ও করুণার বিবরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭

৪. অচ্যুত গোস্বামী, *বাংলা উপন্যাসের ধারা* (কলিকাতা, পাঠখবন, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬৮), পৃ. ২২

৫. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস* (কলকাতা, প্রথম দে'জ সংস্করণ : ২০০০), পৃ. ১১৪

৬. *ফুলমণি ও করুণার বিবরণে*-র দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স কর্তৃক প্রকাশিত হয়। *ফুলমণি ও করুণার বিবরণে*-র চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণটি বর্তমানে অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য।

—দ্রষ্টব্য : হান্না ক্যাথেরিন ম্যলেন্স, *ফুলমণি ও করুণার বিবরণ*, সংগ্রহ ও সম্পাদনা-বকুল রোজারিও, প্রাগুক্ত, বর্তমান সংস্করণের ভূমিকা।

৭. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, (কলকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, সপ্তম পুনর্মুদ্রণ, ১৯৮৪), পৃ. ২৫

৮. *ফুলমনি ও করুণার বিবরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

৯. বিনয় ঘোষ, *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র-প্রথম খণ্ড* (১৮৪০—১৯০৫) (কলকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৬২), পৃ. ১০০

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

১১. ঐ, পৃ. ৩০

১২. ঐ, পৃ. ১১৬

১৩. ঐ, পৃ. ২৭

১৪. ঐ, পৃ. ৪৯

১৫. ঐ, পৃ. ১২০

১৬. ঐ, পৃ. ১১৪

১৭. শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ* (ঢাকা, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০০৬), পৃ. ১৪৭

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করার বিষয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত *সাহিত্য সাধক চরিতমালা*-য় লিপিবদ্ধ আছে :

"এই সময়ে কৃষ্ণমোহন পাদ্রী আলেকজাণ্ডার ডাফের সঙ্গে পরিচিত হইলেন। ডাফ উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইয়া খ্রীষ্টতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহাকে উপদেশ ও শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। বৎসরখানেক এইরূপ উপদেশ ও শিক্ষা লাভের দরুন কৃষ্ণমোহন ধীরে ধীরে খ্রীষ্টধর্ম্মে অনুরাগী হইয়া উঠেন। শেষে নিজ 'এন্‌কোয়ারার' পত্রে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণের সঙ্কল্পের কথাও তিনি ব্যক্ত করিলেন। ১৮৩২ সনের ১৬ই অক্টোবর ডাফের গৃহে তৎকর্তৃক কৃষ্ণমোহন খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন।" —যোগেশচন্দ্র বাগল লিখিত রামকমল সেন, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, *সাহিত্য সাধক চরিতমালা-৬ষ্ঠ খণ্ড*, (কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, প্রথম সংস্করণ, পৌষ ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৩৩

১৮. *ফুলমণি ও করুণার বিবরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০
১৯. ঐ, পৃ. ৭৯
২০. বিনয় ঘোষ, *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র—প্রথম খণ্ড* (১৮৪০—১৯০৫), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২-১৯৩
২১. ঐ, পৃ. ১৯৫
এদেশীয়দের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করার ব্যাপারে সে সময়ে প্রকাশিত পত্রিকার আরো বিবরণ পাওয়া যায়। ৬ জুলাই ১৮৩৩ তারিখে প্রকাশিত 'সমাচার দর্পণে' বলা হয়েছে—
"বড় বাজার নিবাসী নীলমণি নন্দির একটি পুত্রকে ঐ মত কৃষ্টাবান্দা আর কএক জন মিসিনরি বাটী হইতে বাহির করিয়া লইয়া যায় আর কলিঙ্গা নিবাসি রামমোহন ঘোষের পুত্রকেও তাদৃশ প্রকারে লইয়া গিয়া খ্রীষ্টিয়ান্ করিয়াছে অপর কাশীনাথ চক্রবর্ত্তির এক পুত্র অপর কালু ঘোষনামে আর এক গরীব কায়স্থের পুত্রকে খ্রীষ্টিয়ান্ করিয়াছে...।" —ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত ও সম্পাদিত, *সংবাদপত্রে সেকালের কথা—দ্বিতীয় খণ্ড* (১৮৩০—১৮৪০), (কলকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-মন্দির, প্রথম প্রকাশিত, বৈশাখ ১৩৪০ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১৭৪
২২. বিনয় ঘোষ, *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজ চিত্র—প্রথম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩
২৩. *ফুলমণি ও করুণার বিবরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩
২৪. ঐ, পৃ. ১৭
২৪. ঐ, পৃ. ১১৮
২৬. ঐ, পৃ. ৫৩
২৭. ঐ, পৃ. ১৩
১৮৯১ সালের Census of India (Bengal) থেকে জানা যায়, ১৮৯১ সালে বাংলাদেশে ০ থেকে ৪ বছর বয়সী হিন্দু বাল্যবিধবা ছিল ২৩৪৮ জন। এছাড়াও ৫ থেকে ৯ বছর বয়সী বিধবা ছিলেন ৭৯৬৪ জন। —দ্রষ্টব্য : মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন, *বাংলা প্রহসনের আলোকে উনিশ শতকের বাঙলা ও বাঙালী সমাজ*, (ঢাকা, বাংলা একাডেমী, প্রথম সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫), পৃ. ৮১
২৮. *ফুলমণি ও করুণার বিবরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮
২৯. ঐ, পৃ. ১০৮
৩০. ঐ, পৃ. ১১১
৩১. ঐ, পৃ. ১১১
৩২. ঐ, পৃ. ১০৯
৩৩. ঐ, পৃ. ১১১
৩৪. ঐ, পৃ. ২৪
৩৫. ঐ, পৃ. ১৫
৩৬. ঐ, পৃ. ৯১
৩৭. ঐ, পৃ. ৫৩
৩৮. ঐ, পৃ. ৮৮
৩৯. ঐ, পৃ. ৭০
৪০. ঐ, পৃ. ১১৪
৪১. ঐ, পৃ. ১১৭
৪২. চিকিৎসাবিদ্যায় বিদ্যালাভকারীদের আর্থিক লাভের একটি তথ্য পাওয়া যায় ২৮ মার্চ ১৮৪০ তারিখে প্রকাশিত একটি পত্রিকায়। তথ্যটি এরকম—

"চিকিৎসা বিদ্যাতে উত্তীর্ণ ছাত্র এক জন শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ গুপ্ত এতদ্দেশীয় এক ঔষধালয় স্থাপন করাতে এবং ঐ উদ্যোগেতে যে ধন ব্যয় হইয়াছে তদ্দারা অত্যন্ত লাভ সম্ভাবনা দেখিয়া অন্য দুই জন ছাত্র তদ্রুপ বাহুল্যমতে অপর এক স্বতন্ত্র ঔষধাগার স্থাপন করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন।" —ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সংবাদপত্রে সেকালের কথা—দ্বিতীয় খণ্ড* (১৮৩০—১৮৪০), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩

৪৩. বিনয় ঘোষ, *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র—প্রথম খণ্ড* (১৮৪০—১৯০৫), প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩
তখনকার মেডিকেল শিক্ষা সম্পর্কে ১৫ নভেম্বর ১৮৪২ তারিখে প্রকাশিত বেঙ্গল স্পেক্টেটর পত্রিকায় লেখা হয়েছে—
"মেডিকেল কালেজের ছাত্রদিগের বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে যাহা পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম তদ্বিষয়ে আমাদিগের ভ্রমোপশম হইয়াছে। চিকিৎসালয় এবং ঔষধাগার এবং মিউজিয়ম অর্থাৎ আশ্চর্য্য দ্রব্যালয়দির ব্যয় সম্বলিত ঐ বিদ্যালয়ে বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে সর্ব্বশুদ্ধ প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি মাসে ৭০ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে ইহাতে আমাদিগের মনে এই আহ্লাদ জন্মিতেছে যে উক্ত কালেজ এবালিস অর্থাৎ লোপ করণের বিষয়ে যে জনশ্রুতি তাহা সম্ভব নহে।" —বিনয় ঘোষ, *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র-ষষ্ঠ খণ্ড*, (কলকাতা, প্যাপিরাস, পুনর্মুদ্রণ : অক্টোবর ১৯৮৩), পৃ. ১২৭-১২৮

৪৪. *ফুলমণি ও করুণার বিবরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬

৪৫. ঐ, পৃ. ১৫

৪৬. "১৮৫২ সালে মহামারী সম্পর্কে সংবাদপত্রে একটি খবর—
'...গ্রামকে গ্রাম উজার হইয়া যাইতেছে, যে পরিবারে ১০ জন মনুষ্য, সেই পরিবারে ২ জন জীবিত আছে কিনা সন্দেহ। কোন কোন গৃহ এককালীন জনশূন্য হইয়াছে, অনেকে বাসস্থান ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতেছে...সকলেই মরিয়া যাইতেছে, অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টির নিকট এক প্রকার পার আছে, এই যমবৃষ্টি একেবারে সৃষ্টি নাশ করিয়া বসে, ইহার কিছুতেই নিস্তার নাই।" —'সম্বাদ প্রভাকর', ২১.১.১৮৫২, উদ্ধৃত : মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ*, (ঢাকা, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬), পৃ. ৬২

৪৭. J. Westland, A Report on the District of Jessore : its Antiquities, its History and its commerce, Calcutta, ১৮৭৪, pp. ১৩৯-৪৩. উদ্ধৃত : মুনতাসীর মামুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২-৩৩
ঢাকায় প্রতি বছর দুইবার— ফাল্গুন চৈত্রে, ব্রহ্মপুত্র স্নানের পর এবং বর্ষাকালে, কলেরার প্রকোপ দেখা দিত। তখন মনে হতো ঢাকা একেবারে জনমানব-শূন্য হয়ে যাবে। —হেমলতা সরকার, "স্বর্গীয় ব্রজসুন্দর মিত্র ও উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পূর্ববঙ্গে শিক্ষা সমাজ ও ধর্মান্দোলনের আংশিক চিত্র", কলকাতা, ১৯৫১, পৃ. ৪৫২, উদ্ধৃত : মুনতাসীর মামুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

৪৮. *ফুলমণি ও করুণার বিবরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

৪৯. ঐ, পৃ. ৪৪

৫০. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত ও সম্পাদিত, *সংবাদপত্রে সেকালের কথা—দ্বিতীয় খণ্ড (১৮৩০—১৮৪০)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

৫১. *ফুলমণি ও করুণার বিবরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

৫২. *সংবাদপত্রে সেকালের কথা—দ্বিতীয় খণ্ড (১৮৩০—১৮৪০)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩

৫৩. বিনয় ঘোষ, *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র—প্রথম খণ্ড (১৮৪০—১৯০৫)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১

৫৪. *ফুলমণি ও করুণার বিবরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

৫৫. ঐ, পৃ. ৭৩

৫৬. ঐ, পৃ. ৭৩

৫৭. ঐ, পৃ. ৭৩
৫৮. ঐ, পৃ. ৫৭
৫৯. ঐ, পৃ. ৩১
৬০. ঐ, পৃ. ২৬
৬১. ঐ, পৃ. ১২
৬২. ঐ, পৃ. ১৫
৬৩. ঐ, পৃ. ২৫
৬৪. ঐ, পৃ. ৯২
৬৫. বিনয় ঘোষ, *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র—প্রথম খণ্ড (১৮৪০—১৯০৫)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০
৬৬. ঐ, পৃ. ১০০
৬৭. *ফুলমণি ও করুণার বিবরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২
৬৮. ঐ, পৃ. ১২২
৬৯. ঐ, পৃ. ৫৮
৭০. ঐ, পৃ. ৬০
৭১. ঐ, পৃ. ৬১
৭২. ক. "লোকসংস্কার প্রধানত, নিরক্ষর লোক সমাজে (Non-Literate Society) ও অল্পাধিক পরিমাণে সভ্য ও শিক্ষিত সমাজে (Civilised [civilized] and Literate) প্রচলিত সমস্ত বাহ্যিক কর্মকাণ্ড, যথা অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আচরণাদি ও অপরদিকে মানসিক ক্রিয়াদি যথা ধারণা, বিশ্বাস, প্রবণতা ও সহজাত প্রবৃত্তিসমূহের মধ্যে এমন সব উপাদানের নাম, যার মধ্যে যুক্তি (Reason) অপেক্ষা অ-যুক্তির (Unreason) প্রাধান্যই বেশী।" —আবদুল হাফিজ, .*লৌকিক সংস্কার ও মানব-সমাজ*, (ঢাকা, মুক্তধারা, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ১৯৭৫), পৃ. ২

খ. "লোকবিশ্বাস ও সংস্কার আপাতদৃষ্টিতে এক মনে হলেও উভয়ের মধ্যে কিছুটা পার্থক্যও আছে। বিশ্বাস পূর্ণাঙ্গ রূপ নেয়ার আগেই মন থেকে তিরোহিত হতে পারে, কিন্তু কোনো বিশ্বাস যখন পূর্ণরূপ নিয়ে ক্রিয়ার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে তখন তা হয় সংস্কার।" —মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *যার যা ধর্ম*, (ঢাকা, ঐতিহ্য, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৯), পৃ. ৪৪৭
৭৩. *ফুলমণি ও করুণার বিবরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮
৭৪. ঐ, পৃ. ৪৫
৭৫. ঐ, পৃ. ৩৮
৭৬. ঐ, পৃ. ১১৪
৭৭. ঐ, পৃ. ১১৫
৭৮. ঐ, পৃ. ১২১
৭৯. ঐ, পৃ. ৭২
৮০. ঐ, পৃ. ৮০